কীর্তিমানের কাছাকাছি

নাহিদ খান

বাংলা সাহিত্য সংসদের সুবাদে গত মার্চ মাসে হয়ে গেল পরপর দুটি মনোজ্ঞ সাহিত্য সন্ধ্যা। এপার বাংলা আর ওপার বাংলা থেকে এলেন দুই খ্যাতনামা সাহিত্যিক যাঁদের সান্নিধ্যে পাওয়া গেল উচ্চমার্গের জীবনবোধ এর নিকষিত হেম। বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক, গবেষক গোলাম মুরশিদ আর নন্দিত কথা সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়। একজন বাংলা ভাষা, সাহিত্য, সমাজ, সংস্কৃতি বিষয়ে পন্ডিতজন। আর অন্যজন গল্প, উপন্যাস সৃষ্টিতে শিল্পীপ্রতিম। দু'জনের বক্তব্য ছিল দু'ধরনের- আকর্ষণীয়, সুন্দর। এই দুই কীর্তিমানের প্রজ্ঞা এত গভীর, জীবনবোধ এত প্রখর, চিন্তাধারা এত উচ্চাঙ্গের যে এই ক্ষুদ্র লেখকের পক্ষে তাঁদের কীর্তির বিশ্লেষণ করা সাগরের ঢেউ গোনার ব্যর্থ চেষ্টার মত। সুতরাং কীর্তিমানের কাছাকাছি এলে কি অনুভূতি মনে জাগে বড়জোর সেটুকুই হয়ত বলা যায়।

গোলাম মুরশিদ-এর সাথে সাহিত্য সন্ধ্যাটি ছিল ৭ই মার্চ। তিনি ঢাকা থেকে একটি মহাসাগর এবং অন্তত ডজন খানেক নদী পাড়ি দিয়ে ৫ই মার্চ মেলবোর্নে এসে পৌছালেন। এসেই ঘোষণা দিলেন আহার ও বিহারে তাঁর নিতান্তই অরুচি। একটু দমে যেতে হোল, কারণ বাংলা সাহিত্য সংসদের সদস্যদের কাছে প্রধান আকর্ষণ সাহিত্যিক-এর সাথে আড্ডা। সাধারণত লেখক যতদিন থাকেন প্রতিদিনই একটি সান্ধ্যভোজ এবং তারপরই গল্প-আলোচনার মাঝে লেখকের অভিজ্ঞতার আলোকে পৃথিবীকে দেখা একটি অলিখিত নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে। বলাই বাহুল্য যে, এ-সময়গুলো অত্যন্ত উপভোগ্য। প্রথমদিন থেকেই মনে ভাবনা এই কাষ্ঠ সাহিত্যিক-এর সাথে পরবর্তী সাতদিন কি করে কাটবে।

অন্যদিকে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় এলেন সিডনী থেকে ঢাউস এক ব্যাগ বই নিয়ে। যাকে দেখামাত্র 'দুরবীণ', 'যাও পাখি' আর 'পার্থিব'-র মতো উপন্যাসের দৃশ্যাবলী মানসপটে ভেসে উঠল। তাঁকে কি বলা যায়, কি জিজ্ঞেস করা যায় ভাবতে ভাবতেই বিমানবন্দরের চিরাচরিত কফি পর্বটি শেষ করে, এই সাহিত্যসাধক কেমন হবেন সেই বিরাট প্রশ্নবোধক চিহ্ন মাথায় নিয়ে বাড়ির পথে পা বাড়াতে হোল। তাঁর সাথে সাহিত্য সন্ধ্যার আয়োজন ২২ শে মার্চ।

৬ ই মার্চ শুক্রবার, Institute of Post Colonical Studies গোলাম মুরশিদের জন্য একটি সেমিনার আয়োজন করেছিল। তিনিই প্রধান বক্তা এবং বলছিলেন প্রবাসে বাঙালী অভিবাসন, সংস্কৃতি চর্চার কথা। যে আলোচনার ভিত্তিমূলে ছিল ২০০৮ সালে তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ 'কালাপানির হাতছানি-বিলেতে বাঙালীর ইতিহাস'। সেদিনের সেমিনারে লোকসংখ্যা ছিল অপ্রতুল কিন্তু আলোচনা জমে উঠেছিল বেশ। বিশেষ করে উপস্থিত মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রী ক'জন বিষয়টিতে ভীষণ আগ্রহ বোধ করেছে। আসলে 'কালাপানি' ব্যাপারটাই ছিল অনেকের কাছে অভিনব। সাগর পাড়ি দেয়া যে একটি গর্হিত কাজ, ধর্মীয় ও সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে, এ-যুগের ছেলেমেয়েদের কাছে সেটা অদ্ভুত ঠেকারই কথা। গোলাম মুরশিদ আরও আলোচনা করেছেন কিভাবে সেই উনিশ শতকের শুরু থেকে বাঙালি আজ পর্যন্ত ইংল্যান্ডে প্রভাবিত হয়েছে এবং নিজেদের প্রভাব বিস্তার করেছে। সেই রাতে সেমিনার শেষে প্রথম বাংলা সাহিত্য সংসদের প্রায় সকল সদস্যের সাথে এক নৈশভোজে তাঁর দেখা হোল। তাঁকে

আনুষ্ঠানিক ভাবে 'দখিনা প্রয়াসের 'গোলাম মুরশিদ' সংখ্যার প্রথম কপিটি উপহার দেয়া হোল। তিনি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে সেটি গ্রহণ করলেন এবং আসর মাতিয়ে প্রচুর গল্প করলেন।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যয় ঘুরে বেড়াতে পছন্দ করেন। প্রথম দু'দিন মেলবোর্নের আশেপাশে ঘোরাঘুরি করে ২১ শে মার্চ সন্ধ্যায় নৈশভোজ পরবর্তী আড্ডায় বসলেন। বললেন তাঁর লেখক হয়ে উঠার অভিজ্ঞতার কথা, দেশ পত্রিকার কর্ম অভিজ্ঞতার কথা, আরও জানালেন নিজে কবিতা না লিখলেও কবিতা পড়তে ভীষণ ভালোবাসেন। তাঁর মতে কবিতা কেউ চেষ্টা করে লিখতে পারে না, কবিতা কবির কাছে আপনি আসে আর পাঠককে নিয়ে যায় এক অন্য জগতে। তিনি স্বল্পভাষী কিন্তু অন্যদের কথা শুনতে পছন্দ করেন। পরিমিত আহার এবং নিয়মানুবর্তিতার কারণে শরীরটাকেও অটুট রেখেছেন অশীতিপরের শেষ লগনে।

ফিরে যাওয়া যাক গোলাম মুরশিদ পর্বে। ৭ই মার্চ একটি ভাল সংখ্যক দর্শকের সাথে হোল তাঁর সাহিত্য সন্ধ্যা। তিনি মূলত প্রাবন্ধিক এক গবেষক, সুতরাং তাঁর দর্শকশ্রোতারা ছিলেন সত্যিকার অর্থে ভাষানুরাগী জন। অনুষ্ঠানে তিনি নিজের কথা বললেন সামান্যই, তবে বিপুল আলোচনা করলেন 'হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি' নিয়ে। এই কঠিন কঠিন বিষয়গুলো তাঁর সাবলীল উপস্থাপনায় হয়ে উঠল বেশ প্রাণবন্ত। এই আলোচনার বাঙালির কোন বিষয়ই বাদ পড়েনি। তবে বিশদ আলোচনার সময় ছিল না বলে তিনি ব্যাপারগুলোকে দেখেছেন একটি উচ্চতা থেকে যেখান থেকে অনেক খুঁটিনাটি বিষয় বাদ পড়ে গেছে সংগত কারণেই। বললেন, 'নদীতে যখন কেউ সাঁতার কাটে সে কি আর বুঝতে পারে নদী কোথায় বেঁকে গেছে। নদীর বাঁকগুলো বোঝার জন্য উঠতে হয় উঁচু পাহাড়ে। তেমনি আমাদের সংস্কৃতির মূল মাইলফলকগুলো বোঝার জন্য দেখা প্রয়োজন এক সার্বিক, বৃহত্তর চিত্র যেখানে কিছু কিছু রং মিশে একটি অস্পষ্ট অবয়ব তৈরি করবে। কিন্তু প্রধান বিষয়, জায়গা, সময়, জন সেখানে স্পষ্ট একটি আকৃতি তুলে ধরবে যা বাঙালি সংস্কৃতিকে বুঝতে সাহায্য করবে।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যয় ২২শে মার্চ সাহিত্য অধিবেশনে ভক্তদের মন ভরিয়ে দিলেন। দীর্ঘ দেড় ঘণ্টার বক্তৃতায় বললেন তাঁর জীবন বোধের কথা। বললেন, জীবন মানে প্রতিটি দিন অনুভব করা, হয়ত প্রতিদিন উপভোগ করা নয়। নদী শেষ পর্যন্ত সাগরেই পৌছাবে, সেটা বড় কথা নয় বরং চলার পথে দু'তীরের সকল পাথেয়-ই জীবন। তিনি যখন বলছিলেন হল ঘরে বোধ হয় একটি গাছের পাতা পড়লেও শোনা যেত। এমনই নিশ্ছিদ্র নীরবতা ছিল সেখানে। দু'একটা মজার গল্পও করেছেন তিনি। বাংলাদেশ ছেড়ে যাবার কালে পিঁপড়া কি করে কামড়ে ধরেছিল তাঁকে, সেটা আজও মনে করেন। কথা উঠেছিল তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসের প্রেক্ষাপট নিয়ে, তিনি কেন বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কিছু লেখেন না তার কারণ, সেখানে তাঁর খুব একটা থাকা হয় না। একটি ভৌগলিক অবস্থানের পারিপার্শ্বিকতা ভালভাবে না জেনে লিখলে সে উপন্যাসের প্রতি সুবিচার করা হয় না বলেই তাঁর ধারণা। তাঁর গল্প, উপন্যাসের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি সবসময় ঘটনাসমূহকে একটি ইতিবাচক পরিণতির দিকে নিয়ে যান। সেই প্রসঙ্গে বললেন এটা তিনি সুচিন্তিত ভাবেই করেন কেননা ইতিবাচক পরিণতি মানুষকে একটি সঠিক দিক নির্দেশনা দেয়। এই দিক নির্দেশনা ছাড়া সাহিত্যে কখনোই একটি মহৎ শিল্প হয়ে উঠতে পারে না।

মেলবোর্নে গোলাম মুরশিদের সাথে শেষ দিনটিও ছিল চমৎকার। তিনি বাঙালি স্থাপত্যের এক বিশদ বর্ণনা দিলেন তাঁর নিজের সংগৃহীত প্রচুর ছবি ব্যবহার করে। সত্যি অভিভুত হতে হয় তাঁর জ্ঞানভান্ডারের পরিধি অনুমান করে। তাঁর তুলনারহিত মননশীলতা, ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, সমাজ

সবকিছুকে ছাপিয়ে এক কীর্তিমান মানুষকে উপস্থাপনা করে। যিনি নিজেকে পরিচয় করিয়ে দেন প্রথমত: মানুষ, দ্বিতীয়ত মানুষ, তৃতীয়ত মানুষ এবং শেষ পর্যন্ত মানুষ হিসাবে। তাঁর এই পরিচয় যে কতটা সত্য তা তাঁর নারী বিষয়ক গদ্য থেকে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। সম্পূর্ণ নির্মোহ দৃষ্টিতে তিনি নারীর যোগ্য মর্যাদার কথা বারবার মনে করিয়ে দিয়েছেন। সবশেষে বলেছিলেন পৃথিবীর অনেক জায়গায় আমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলেন তিনি তবে বাংলা সাহিত্য সংসদ তথা মেলবোর্নের মত এত একাত্মতা কোথাও বোধ করেননি।

মেলবোর্নের শেষ আড্ডায় শীর্ষেন্দু ছিলেন অনেক প্রাণবন্ত এবং স্বাচ্ছন্দ্য। গল্প করলেন অনেক। বলেছিলেন কেন মানুষ একটি অতিমানবীয় ক্ষমতায় বিশ্বাস করে। তাঁর মতে সেটিই মানুষের শেষ আশ্রয়। তাঁর সুস্পষ্ট প্রতিবাদ ছিল বিজ্ঞানের তেমন প্রগতির যা পৃথিবীকে ছাড়িয়ে অন্যগ্রহের সন্ধানে সময় এবং অর্থ ক্ষেপন করে। কেননা তিনি বিশ্বাস করেন বিজ্ঞান হবে মানবকল্যাণের জন্য। যেখানে পৃথিবীর অর্ধেক মানুষ অসহায়ত্বের মাঝে দিন যাপন করে সেখানে এই পৃথিবীর মানুষই যখন অন্য গ্রহের পেছনে ছুটে সেটাকে ঠিক মেনে নিতে পারেন না। যাবার বেলায় বলে গেলেন নাচ-গান ছাড়াও যে শুধু সাহিত্য আসর হয় তা দেখতে পেয়ে তিনি অনেক আনন্দিত হয়েছেন।

এই দুই কীর্তিমানের সান্নিধ্য ছিল যেমন উপভোগ্য তেমনি জীবনবোধ উন্মোষক। তাঁদের দুজনের মাঝেই রয়েছে অনন্য কিছু গুণাবলী যা আমাদের অভিভূত করে, ভাবায়, সর্বোপরি মনে করিয়ে দেয় 'সার্থক তব দেখা পাওয়া'।